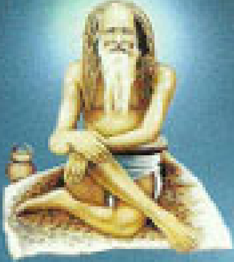

গুরু পূর্ণিমা

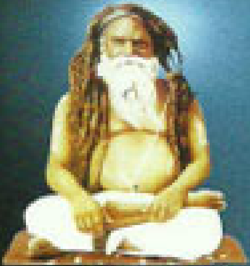

শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী জানকীদাস কাঠিয়া বাবা

গুরু পূর্ণিমা

শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী জানকীদাস কাঠিয়াবাবা

গুরুপূর্ণিমা উৎসব ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ উৎসাহ, উদ্দীপনা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসব সর্বপ্রথম কবে কাহার দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল আমি তাহা জানি না। তবে এই উৎসবটি কেন পালিত হয় তাহা লইয়া মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে। এই প্রশ্ন শুধু গুরুপূর্ণিমা উৎসবের নয়, যে কোন উৎসব সম্বন্ধেই হইতে পারে। উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে মূলতঃ আনন্দ পাওয়াটাই বোধ হয় আসল লক্ষ্য। এই আনন্দ বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। যেমন–কেহ বলেন আমি আনন্দ চাই। কেহ বলেন আমি শান্তি চাই। কেহ বলেন আমি সুখ চাই। এই শান্তি, সুখ বা আনন্দ কথাগুলির শব্দগত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। গীতায় এক জায়গায় বলা হইয়াছে "অশান্তস্য কুতো সুখম্।" অশান্তের সুখ কোথায়? তাহা হইলে দেখা যায় শান্ত হইলে সুখ আসে। শান্ত হওয়ার অর্থ কি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। পরস্পর দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইলে আমরা বলিয়া থাকি 'আপনারা শান্ত হোন'। বিচার করিলে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে সমাধান না পাওয়া গেলে পরস্পরের মনের মধ্যে

উত্তাপ জন্মে। এই উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ ঝগড়া। কাজেই 'আপনারা শান্ত হোন'—এই কথাটির অর্থ মনের উত্তাপকে শান্ত করা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি জ্বলন্ত আগুনকে নিভাতে গেলে হিন্দী ভাষায় বলে-অগ্নিকো (আগকো) শান্ত করো। অর্থাৎ অগ্নিকে নিভাইয়া দেওয়া। অগ্নি আমাদিগকে তাপ দেয়। অবশ্য কোন সময় এই অগ্নির তাপ গ্রহণেরও প্রয়োজন পড়ে। যেমন শীতে। ইহা বাহ্যতাপ। মনের তাপ ভিতরের। মন অহরহ কোন না কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে। সাধারণভাবে দেখা যায় জীবনের কখনই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। একের পর এক আকাঙ্ক্ষা চলিতেই থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা ভালর জন্যই হোক, আর মন্দের জন্যই হোক। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এই ক্রোধ-ই মনের তাপ। এই তাপ শান্ত হইলে সুখের উৎপত্তি হয়। কিন্তু নিবৃত্তি সাময়িক হইলে সুখটাও সাময়িক হয়। চির নিবৃত্তি হইলে চির সুখের উৎপত্তি হয়। এই ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক সুখের সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে "সুখেষু বিগত স্পৃহঃ"—সুখে স্পৃহা শূন্য হও। আবার অন্য দিক দিয়া যদি আমরা বিচার করি শুধু মানুষ নয় সর্বপ্রাণীরই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সুখ পাওয়া এবং সেই সুখটা আবার এমন হওয়া চাই যে সুখটা আমাকে কখনও

ছাড়িয়া যাইবে না। যেমন, আমি সর্বদা এবং সর্বক্ষণই যেন সুখে থাকি। সাময়িক সুখে আমার মন পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। এই অতৃপ্ত সুখের আকাঙ্ক্ষায় আমরা পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে থাকি। মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু–এই স্রোত চলিতেই থাকে। তাহা হইলে কোন কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি সেই স্থায়ী সুখ লাভের ইচ্ছা করেন এবং সেই স্থায়ী সুখ কি করিলে লাভ করা সম্ভব এইরূপ যদি একটা অন্বেষণ করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তিটিকে উপহাস করা সঙ্গত কিনা বিবেচক ব্যক্তিরা তাহা বিবেচনা করিবেন। এখানে আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া যায়, সুখটা আমরা চাই–এই চাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত। কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। আর একটা জিনিষ আমরা চাই না কিন্তু না চাহিলেও অহরহ আসিয়া পড়ে। এই জিনিষটার নাম দুঃখ। আমরা নানা রোগে শরীরের দুঃখ পাই। মনের বিরুদ্ধ আচরণে মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব করি। প্রাণী হইতে আমরা দুঃখ পাইয়া থাকি। প্রকৃতি হইতেও দুঃখ পাইয়া থাকি। এক জীব আর এক জীবকে দুঃখ দেয়। প্রাকৃতিক নানাবিধ দুর্যোগ আমাদিগকে দুঃখ দেয়। শুধু এই নয়, খুব নজর দিলে দেখা যায় পারিবারিক জীবনে আমাদের সংসারের মধ্যেও মনোগত নানাবিধ

সংঘাত, ঝগড়া-ঝামেলা লাগিয়াই থাকে। এই দুঃখগুলি কিন্তু বাস্তবে আমরা চাহি না। কিন্তু আমরা না চাহিলেও দুঃখগুলি আসিয়া আমাদিগকে পীড়া দেয়। এই দুঃখটাকে সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এই দুঃখের আঘাতে পীড়িত হইয়া এই দুঃখের নিবৃত্তির পথ আমরা খুঁজিয়া থাকি। সাংখ্য দর্শনে তাই উল্লেখ আছে–"দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা"। এই জিজ্ঞাসা সুখের জিজ্ঞাসা। আবার শুধু সুখের জিজ্ঞাসা নহে, শাশ্বত বা চিরস্থায়ী সুখের জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ চিরস্থায়ী শাশ্বত সুখটি কোথায়?–এর উত্তরে আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখম্"। অর্থাৎ ভূমাতেই সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি", অল্পেতে সুখ নাই, বেশীতে সুখ। তাই আমরা রাত দিনই বেশী চাই। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকি না। এই অল্প আর বেশী–দুইটি কথার আসল অর্থ, অল্প মানে ক্ষণস্থায়ী যেটা তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়। বেশী মানে দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী। আমরা এমন টাকা চাই যে টাকা সারাজীবনেও ফুরাইবে না। এমন বাড়ী চাই যে বাড়ী জীবনে ভাঙ্গিবে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বাড়ীও ভাঙ্গিয়া যায়, টাকাও ফুরাইয়া যায়। তাহা হইলে বেশী

আমরা চাহিব–যে বেশীটি কোনদিনই ফুরাইয়া যাইবে না। সেইটাই কোথায় আছে আমাদের বিবেচ্য। বেদান্তে বলিয়াছেন–যেখানে সন্দেহ সেখানে জিজ্ঞাসা। যেখানে প্রয়োজন সেখানে জিজ্ঞাসা। এরই বেদান্তের প্রথম উল্লেখ–'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। অর্থাৎ যদি কোন এক ব্যক্তি জন্মের পর জন্ম প্রচুর অর্থ, ঘর-বাড়ী, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য লাভ এবং ভোগ করিয়াও মনের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ না করেন–মনের অতৃপ্ততা অনুভব করেন তাহারই জিজ্ঞাসা জাগে যে তাহা হইলে মনের পূর্ণ তৃপ্তি বা সুখ কোথায়? এই সুখ অর্থ, ধনদৌলত, রাজ্য প্রভৃতিতে, না অন্য কোথাও? বেদান্ত উত্তর দিলেন–এই সুখ ব্রহ্মেতে। উপনিষদ উত্তর দিলেন–এই সুখ ভূমাতে। সাংখ্যের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ চির সুখ লাভ। সব মিলাইয়া এই সুখ কথাটিই আমরা শাস্ত্রে পাই। বাইবেলেও বলে–Everyone hankers after happiness. প্রত্যেকেই সুখ চায়। আবার উপনিষদ বলিতেছেন, অল্পেতে সুখ নাই। অর্থাৎ যে বস্তু চিরকাল থাকে না সেই বস্তু চিরকাল সুখও দিতে পারে না। জাগতিক কোন বস্তু চিরস্থায়ী নহে। কাজেই এই অস্থায়ী বস্তু হইতে স্থায়ী সুখ পাইব বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অথচ জাগতিক কোন

বস্তু আমরা ত্যাগও করিতে পারিব না। সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে একটুখানি বাড়ীঘর প্রয়োজন; প্রয়োজন মত খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ না থাকিলেও আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। তাই হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" আগে শরীর পরে ধর্ম। এই শরীরকে সুস্থ সবল রাখিলাম, ঘর-বাড়ী, ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র সবই পাইলাম তবুও যদি দেখি সুখের অভাব; আর যদি সত্যই অনুভব করি এই সব জিনিষ আমাদের না হইলেও চলিবে না, অথচ ইহাতে আমরা পূর্ণ সুখীও হইতেছি না—তখন যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারের সকল বস্তুর মধ্যে থাকিয়াও সেই শাশ্বত সুখের অন্বেষণ করেন তবে তাহাকে উপহাস করা ঠিক হইবে কিনা চিন্তাশীলরাই তাহা দেখিবেন। সেই শাশ্বত সুখের উৎস বা খনি যদি ভূমা হইয়া থাকেন সেই ভূমারই অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থ বড় হইতেও বড়; যাহার চেয়ে আর বড় কিছুই নাই। অর্থাৎ যাহার চেয়ে আর বেশী কিছু নাই। সেই বেশীতেই চিরস্থায়ী সুখ। সেই ব্রহ্মের অপর নাম আত্মা (পরমাত্মা)। সনাতন শাস্ত্র বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিত পাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্।" সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমিৎ

পাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যান। গুরুর বিশেষণটি এখানে শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মসমাহিত। শিষ্যটির সহিত বিশেষণ দেওয়া হইল সমিত পাণি। সমিৎ মানে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। যজ্ঞের কাষ্ঠ হাতে লইয়া শিষ্য গুরুর নিকট গেলেন। প্রাচীনকালের গুরুরা যজ্ঞ করিতেন—তাই যজ্ঞের আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠের প্রয়োজন হইত। বর্তমানকালেও যজ্ঞের আগুন জ্বালাইতে কাঠ লাগে দেখা যায়। গুরুর কাছে গেলেন আত্মাকে জানিবার জন্য। আত্মাকে জানিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কর্মের প্রয়োজন। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার নাম ভক্তি। জ্ঞান যখন পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখন সেই অবস্থাটি ভক্তির অবস্থা। সেই অবস্থাটি শাস্ত্রীয় ভাষায় "তৈলধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন স্মৃতি-সন্তানরূপা ধ্রুবাস্মৃতিঃ।" জ্ঞানটি মধ্যে স্থিত। নিচে কর্ম উপরে ভক্তি। জ্ঞান দুটিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞান মানে অজানা বস্তুকে যে জানাইয়া দেয়। জ্ঞানহীন কর্ম এবং জ্ঞানহীন ভক্তি আত্মাকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারে না। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জ্ঞানী আমার অতীব প্রিয়। আবার শাস্ত্রানুসারে জ্ঞান অর্থ—শাস্ত্র ও গুরু-উপদেশ জনিত জ্ঞান। অর্থাৎ পুঁথিগত ও উপদেশজনিত জ্ঞান।

ইহাতেও পূর্ণতা নাই। পূর্ণতা প্রত্যক্ষে। প্রত্যক্ষেরই নাম বিজ্ঞান। তাই বলিলেন–"তদ্বিজ্ঞানার্থং"। এই বিজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর কাছে যাইবার কথাটি আমরা পাইলাম। এখন এই গুরু বস্তুটি কি আমরা বিচার করিব। পূর্বে বলিয়াছি "সমিৎ" মানে যজ্ঞকাষ্ঠ। কাঠ না হইলে যেমন আগুন জ্বালানো যায় না, জ্ঞানরূপ যজ্ঞেও জ্ঞানাগ্নি জ্বালানোর জন্য যে কাঠের প্রয়োজন সেই কাঠ শিষ্যের 'শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও উপনিষদ' এই নিয়াই শিষ্য গুরুর কাছে যাইবেন। শাস্ত্রে আছে–"শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া, উপনিষদা"। ইহারই অপর নাম–"শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ"; ইহারই অপর নাম কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এইগুলিই যজ্ঞ কাষ্ঠ, জ্ঞানযজ্ঞের কাঠ। এই কাঠ লইয়া গুরুর কাছে গেলে জ্ঞানযজ্ঞের আগুন জ্বালাইতে প্রয়োজন পড়ে। গুরুপূর্ণিমা শব্দের প্রথম শব্দটি গুরু–দ্বিতীয় শব্দটি পূর্ণিমা তিথি এবং তৃতীয় শব্দটি উৎসব। এই তিনটি শব্দ লইয়া আমরা সাধ্যমত আলোচনা করিব।

আমি একজন মানুষ। আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখি আমার একটি রক্ত মাংসের তৈরী শরীর আছে। এই শরীরটার মধ্যে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চর্ম এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। হাত, পা, বাহ্য প্রস্রাবের দ্বার এবং বাক্ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, এর উর্দ্ধে দেখি আছে মন, তাহার উর্দ্ধে একটা

অহং ভাব (অহং) এবং অহং এর উর্দ্ধে বুদ্ধি। এই বুদ্ধির উর্দ্ধে প্রকৃতি (সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন গুণের সমষ্টি)। সাধারণতঃ এই জিনিষগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কথায় বার্তায় এই শব্দগুলি উচ্চারণও করি। যেমন চোখের অসুখ, নাকের অসুখ, এই লোকটি অহংকারী, আমার মনটা ভালো না। এই লোকটি বুদ্ধিমান, এই লোকটির প্রকৃতি (স্বভাব) ঠিক না। এই শব্দ বা বস্তুগুলি লইয়া আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ কোন সন্দেহ বাদ-বিবাদ উপস্থিত হয় না। এই বস্তুগুলি যেন আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। বিবাদ বা সন্দেহ উপস্থিত হয় একটি বস্তু লইয়া, সেই বস্তুটির নাম আত্মা। এই বস্তুগুলির উর্দ্ধে আত্মা স্থিত। এই বস্তুগুলি আত্মার দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত। আত্মার অস্তিত্বে ইহাদের অস্তিত্ব। এই দেহের মধ্যে আত্মাটি স্থিত। কেহ কেহ বলেন–আত্মা আছেন। কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই। এই আত্মা সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসা। এই দেহস্থিত আত্মাটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বসংশয়ের নিবৃত্তি করিয়া যে অবস্থাটি আমাদের লাভ হয় সেই অবস্থাই আমাদের চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা। এই দেহস্থিত আত্মাটিকে বলা হয় জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। এই জীবাত্মারও যিনি

নিয়ন্তা বা আধার তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। আমরা কোন বস্তু যখন চোখ দিয়া দেখি তখন চোখের পিছনে যদি মন একনিষ্ঠ না থাকে তাহা হইলে সেই দেখাটি সুষ্ঠুরূপে দেখা হয় না। কোন বস্তু যদি কান দিয়া শুনি, কানের পিছনে মন না থাকিলে সেই শোনাটাও ভালরূপ হয় না। স্থির চিত্ত ব্যক্তিগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় কোনটিই এই মনের সাহায্য ছাড়া নিজেদের ক্রিয়া পূর্ণ সফল করিতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গুলির পিছনে নিয়ন্তা রূপে থাকে মন। এই মনের সংজ্ঞা-যে সংকল্প বিকল্প বা জল্পনা কল্পনা করে। ইংরাজীতে মন অর্থে Waves of thought. অর্থাৎ মন মানে চিন্তার স্রোত, এই চিন্তা সু বা কু যাহাই হোক। ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা যেমন আমরা দেখিলাম মনের নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, এই মন সম্বন্ধেও যদি আমরা খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া মনের অনন্ত চিন্তাস্রোতকে শান্ত করিতে পারি তাহা হইলে মন সম্বন্ধেও একটি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ মনের স্বরূপটিকে জানিতে পারিব। মনের যে এই ক্রিয়া শক্তি, এই কার্যকারিতা, চিন্তা স্রোত-মনের অভিজ্ঞতা লাভের পরে দেখিতে পাইব এর পিছনেও আর একটি নিয়ন্তা রহিয়াছে। সেই নিয়ন্তাটির

নাম অহং। এই অহংটি সম্বন্ধেও যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জ্ঞান লাভ করি তাহা হইলে দেখিব তাহার উপরেও একটি নিয়ন্তা রহিয়াছেন। ইহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধি সম্বন্ধেও যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব তখন দেখিব তাহার উপরেও আর একজন নিয়ন্তা রহিয়াছেন। সেই নিয়ন্তাটির নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সম্বন্ধে যখন অনুভবের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিব তখনই আমরা সেই আত্মাটিকে দেহের নিয়ন্তা রূপে জানিতে পারিব। এই আত্মাটিকেও প্রত্যক্ষ করিবার পরে জীব-জগত, সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা রূপে আমরা যে বস্তুটিকে জানিতে পারিব সেই বস্তুটিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

এতক্ষণ এই আলোচনার পরে গুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জিজ্ঞাসা জাগে। মন-ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ আমি নিজে নিজেই করিতে পারি-না অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় ইহাই জিজ্ঞাসা। জাগতিক ক্ষেত্রে শিশুদের যখন হাতে খড়ি দেওয়া হয় তখন একজনে এক একটি অক্ষর লিখিয়া শিশুকে তাহার নাম ও স্বরূপ শিখাইয়া দেন। গান, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্র চালনা প্রত্যেক বিষয়েই একজন অপর জনকে শিখান-ইহা লক্ষ্য করি। স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনে পুরুষের বীর্য যেমন

নিতান্তই প্রয়োজন-বীজ ছাড়া যেমন কোন বৃক্ষই উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে গেলেও একজনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না, তাই গুরুর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। গুরু সম্বন্ধে এখন আমরা একটি আলোচনা করিব।

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা অনন্ত জগত ও জীব রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া যাত্রা বা নাটকের মত একটা আনন্দের খেলা করিতেছেন। এর মধ্যে এই সৃষ্টির দুইটি দিক। একটি নিম্নমুখী অনন্ত স্রোতশালিনী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপে। আর একটি ঊর্দ্ধমুখী স্রোত। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অথবা জন্ম, মৃত্যুর স্রোত হইতে চিরকালের মত মুক্ত হইয়া এক শাশ্বত সত্ত্বায় স্থিতি। এই মোক্ষলাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে আবর্তন—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নাম জীবন। এই অনন্ত জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে চির নিবৃত্তি লাভে জিজ্ঞাসু হইয়া কেহ যদি কাহারও অন্বেষণ করেন তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া তাহাকে চিরতৃপ্ত করিবার জন্য ঐ ব্রহ্মই একটি রূপ ধারণ করেন। সেই রূপই জাগতিক ক্ষেত্রে গুরু। সেই ব্রহ্ম নিজ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবকে চিরশান্তি দিবার জন্য যে রূপটি ধারণ করেন সেই রূপটিই তাঁহার গুরুরূপ। সৃষ্টির প্রথম থেকেই সৃষ্টির দুইটি ধারা। সংসারের পুনঃ পুনঃ

আবর্তন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর স্রোত এবং তাহা হইতে চির নিবৃত্তি—এই দুই ধারা চলিতেছে, মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করা হইল—মনুষ্য দেহধারী গুরুর সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম যখন নিজের মায়াশক্তির দ্বারা গুরুরূপে মনুষ্য দেহটি ধারণ করিলেন তখন হইতেই হয়ত এই গুরুপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেও তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিসত্তার কোন তারতম্য হয় না। তিনি সাধারণ মানুষের মত জীবন-যাপন করেন। খাদ্যাদি গ্রহণ, আবাস, গৃহাদিও থাকে অথচ তাহার উর্দ্ধে সর্বজ্ঞান ও শক্তিমত্তার অক্ষুন্নতাও অব্যাহত থাকে। এই দেহটি গুরুর দেহ যেমন আধার। এই দেহটি শিষ্যের কাছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আদরের জিনিষ। কিন্তু দেহটি মাত্রই গুরু মনে করিলে গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে না। দেহে থাকিয়াও তিনি দেহাতীত। যেমন গঙ্গা একটি জলপ্রবাহ—এই ধারাকে আমরা গঙ্গা বলি। তাহার অনেক ঘাট থাকে। এই ঘাটকে গঙ্গা বলে না। ঘাট ও গঙ্গা এক জিনিষ নয়। কিন্তু গঙ্গাকে পাইবার জন্য আমরা ঘাটে যাই। ঘাটটিতে গেলাম, আর গঙ্গায় ডুব দিলাম না তাহা হইলে আমার গঙ্গাস্নান হইবে না। ঘাটটি যদি এমন হয় যাহাতে

গঙ্গাস্নান সুষ্ঠুরূপে করা যায়, পড়িয়া যাইবার বিপদ-আপদের ভয় না থাকে তাহা হইলে সেই ঘাটটিতেই গেলে গঙ্গাস্নান সুষ্ঠুরূপে করা যায়। এইরূপ ঘাট একাধিকও থাকিবে কিন্তু কোন কোন ঘাট যদি ঠিকমত না হয় তাহা হইলে সেই ঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নান না হইয়া আঘাত প্রাপ্তি (পা পিছলানো ইত্যাদি) হইয়া দুঃখ পাইতে হয়। এই ঘাটের দৃষ্টান্তে বলা যায়, যে দেহে গুরুশক্তির সুষ্ঠু অভিষেক হইয়া থাকে সেই দেহই গুরুশক্তি প্রদানে সমর্থ। এইরকম গঙ্গার একটি ধারাতেই যেমন অনেক ঘাট, একই গঙ্গা–সেইরকম গুরু একজনই-সেই পরব্রহ্ম। যে যে দেহের ভিতর দিয়া তিনি গুরুশক্তি সমন্বিত ধারারূপে যে যে দেহের ভিতর দিয়া তাপিত জীবকে কৃপা করিতেছেন সেই দেহগুলিই গুরু নহে। কিন্তু সেই দেহ আদরের, শ্রদ্ধার ও ভক্তির। কিন্তু গুরু একই, সেই ব্রহ্ম। এখানে গুরু সম্বন্ধে আরো উল্লেখ করিতেছি।

গুরু প্রণামের প্রথমে বলা হইয়াছে–

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

–এখানে অখণ্ড মণ্ডলাকার এক বস্তু সমস্ত বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই বস্তুকে যিনি দেখাইয়া দেন

তিনি গুরু। যাহাকে দেখান তিনি ব্রহ্ম। যিনি দেখেন তিনি শিষ্য। এই শ্লোকে গুরু, ব্রহ্ম ও শিষ্য তিনটি পৃথক পৃথক।

দ্বিতীয় শ্লোকে–

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

–এই শ্লোকেও দেখা যায় যিনি জ্ঞানরূপ শলাকার দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন তিনি গুরু। এখানেও গুরু, শিষ্য এবং ব্রহ্ম তিনটি পৃথক পৃথক। গুরুকে ব্রহ্ম বলা হইল না।

তৃতীয় শ্লোকে–

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

–এখানে গুরুই সৃষ্টিকারী রূপে রজগুণী ব্রহ্মা। স্থিতিকারী রূপে সত্ত্বগুণী বিষ্ণু এবং লয়কারী রূপে তমোগুণী মহেশ্বর। তিনকে অতিক্রম করিয়া গুরুই পরব্রহ্ম। এই শ্লোকে গুরুকে পরব্রহ্ম রূপে বলা হইল। শিষ্যের অজ্ঞান অবস্থা দূর হইয়া জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন না হওয়া পর্যন্ত আত্মদর্শন হয় না। আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত গুরুজ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করে না। তাই আমরা শিষ্য হইবামাত্রই গুরুকে ভগবান বলিয়া

যে বলি ইহা অনুভবজাত জ্ঞান নহে। তবে এই বলাটা প্রয়োজন এবং কল্যাণকর। তবুও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে ইহা বলিতেই হইবে। গুরু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভবজাত জ্ঞান হইলে ঝগড়া-ঝাঁটি, সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না। একটা রাষ্ট্রকে যদি আমরা অখণ্ড মণ্ডলাকার রূপে কল্পনা করি আর তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে (মনুষ্য, গাছপালা সব বস্তুর মধ্যেই) একটি সত্তা সর্বব্যাপকরূপে সর্ববস্তুতে রহিয়াছেন বলিয়া অনুভব করি অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখি আর ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য বিকৃত হইয়া রহিয়াছে দেখি তাহা হইলে আমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, হানাহানি থাকিবে না। বৈচিত্র্যকে পিষিয়া নষ্ট করা যায় না, ঐক্যকেও মুছিয়া ফেলা যায় না। অনন্ত ব্যক্তি সত্ত্বা অবশ্যই থাকিবে। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ নয়। সমাজকে বাদ দিয়া রাষ্ট্র নহে। ব্যক্তিস্বাধীনতাও থাকিবে আবার অখণ্ড ঐক্যবোধও থাকিবে। এই অখণ্ড ঐক্যবোধই গুরুজ্ঞান। গুরু বলিতে বুঝায় শ্রেষ্ঠ। আর ঈশ বলিতেও বুঝায় শ্রেষ্ঠ। 'ঈশ' হইতে ঈশ্বর শব্দ। শ্রেষ্ঠের আর একটি অর্থ মুখ্য, প্রধান। আমরা বলিয়া থাকি প্রধান মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী। আমরা কথায় বলিয়া থাকি Head of the Department. অর্থাৎ বিভাগের প্রধান। এই

কথাগুলিও গুরু শব্দের নামান্তর। রাষ্ট্রপতি যেমন রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে যদি ধরি ব্রহ্ম, প্রধান, মুখ্য ইত্যাদি অনেক দেহের ভিতর দিয়াই সেই রাষ্ট্রপতিরই অভিব্যক্তি। প্রধান মন্ত্রীর পদটি ধারারূপে অব্যাহত থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও তদ্রূপ। যিনি ঐ পদে বসেন তাঁহাকেই আমরা মন্ত্রী মানি। নির্বাচনে জয়ী হইয়া যেমন ঐ পদে বসিতে হয় তদ্রূপ গুরুশক্তিতে অভিষিক্ত হইয়াই গুরু পদবাচ্য হইতে হয়। এইরূপ গুরুর বিভিন্ন পরম্পরা থাকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রীর পরম্পরা।

গুরু শিষ্যকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দীক্ষাদান করিয়া থাকেন। এই দীক্ষা শব্দের অর্থ—গুরু এমন জ্ঞান শিষ্যকে দেন যে জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যের কর্মবাসনা ক্ষয় হয়। (দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্মবাসনা- দীক্ষা সা ইতি উচ্যতে)। বাসনা বা কামনা মনোধর্ম। মনের মধ্যেই কামনার বীজ নিহিত থাকে। গুরুদত্ত বস্তুর সুষ্ঠু ও অনলস আচরণের দ্বারা মনের সর্বপ্রকার কামনা, এক কথায় সর্বপ্রকার চিন্তা দূরীভূত হয়। শিষ্য এই মনোভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানময়াদি ভূমিতে ক্রমশঃ আরূঢ় হন এবং অন্তে নিজ আত্মাকে এবং তৎপর ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।

পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমাটিতেই সাধারণতঃ গুরুপূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পাঞ্জাবাদি পশ্চিমদিকে ব্যাস পূর্ণিমা বলিয়াও কথিত হয়। কেহ্ কেহ্ মনে করেন ব্যাসদেব হইতেই এই পূর্ণিমার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আষাঢ় মাস হরি-শয়ন কাল বলিয়া কথিত হয়। এই সময়টায় শিষ্য বা সাধকের মনোভূমি দুর্বল থাকে। অজ্ঞানাচ্ছাদনটি বেশী হয়। এই সময় এই গুরুপূজার দ্বারা মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং অজ্ঞানাচ্ছাদন বা তমসাচ্ছাদন ভাব অনেকাংশে দূর হয়। আর একটি দিকও বোধ হয় আছে। মনের উপর চন্দ্রের প্রভাব বেশী। এইজন্য সাধনার পক্ষে রাত্রি কালটি বেশী প্রশস্ত থাকে। কারণ চন্দ্রের প্রভাবে মনোবলটি তখন বেশী পাওয়া যায়। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পনের দিন। আর পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনের দিন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দুইটি তিথিতে উপবাস পালনের উপর জোর দেওয়া হয়। উপবাসের অর্থ উপেতে বাস। উপ পূর্বক বস্ ধাতু। নিকটে বাস করা। অর্থাৎ আত্মার নিকটে যাওয়া। আত্মস্থ হওয়া, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। পূর্ণিমার পর দিন হইতে চন্দ্র ক্ষীণ হইতে হইতে অমাবস্যায়

পূর্ণ লোপ পান। আবার অমাবস্যার পর হইতে দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে পূর্ণিমার দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন চন্দ্র। চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে মনোবলের হ্রাস-বৃদ্ধির বিজ্ঞান জড়িত রহিয়াছে। সেইজন্য গুরুপূর্ণিমা তিথিটিতে গুরু পূজার বিজ্ঞানসম্মত মুখ্য দিন। গুরু অর্থাৎ ব্রহ্ম একটি মনুষ্য দেহেতে অধিষ্ঠিত হইয়া শিষ্যের পূজা গ্রহণ করেন। কোন একটি আসনে কোন মূর্ত্তিকে বসাইয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি। তখন ঐ আসনের চেয়ে মূর্ত্তির প্রাধান্যই আমরা বেশী দিয়ে থাকি। আসনটিকেও অবজ্ঞা করি না। আসনটিতে পা ঠেকিলে আমরা প্রণাম করি। কিন্তু পূজা বা ভোগাদি নিবেদন, ধ্যানাদি আসনের করি না, করি মূর্ত্তির। কিন্তু আসনটিকে বাদও দিই না। এইরূপ মনুষ্য দেহটিকে অবজ্ঞা না করিয়া এই মনুষ্য দেহরূপ আসনে অধিষ্ঠিত (দেহের মধ্যে স্থিত) গুরুকে পূজা করাই আসল গুরু পূজা। ইহা কেবল দেহের পূজা নহে। দেহকে অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপক রূপে যে গুরু রহিয়াছেন সেই গুরুর পূজা। তাই "সীমার মাঝে অসীম তুমি"–সেই অসীমের পূজা। এইভাবে গুরু পূজাটি করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক মতভেদ ঝগড়া-ঝাঁটি থাকিতে পারে না। আধার বিভিন্ন থাকিবেই। কিন্তু আধেয় একজনই, দুই নাই।

চব্বিশ ঘন্টায় অথবা সাত দিনে কোন কোন ঘড়িতে চাবি দিয়া থাকি, চাবি শেষ হইলে পুনরায় আবার দিতে হয়, এইরকম সংসারে নানা ঝামেলায় প্রতিদিন আমাদের মন উত্যক্ত থাকে বলিয়া বছরে একটি দিনও বিশেষ ভাবে ঐ পূজা করিতে পারিলে বোধহয় ভাল হয়। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব যেমন আমরা প্রতি বৎসর পালন করিয়া স্মৃতিকে অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করি, এই পূজার উদ্দেশ্যও তাই। যে গুরু আমাকে সর্বদুঃখের পরপারে লইয়া যান সেই গুরুকে অন্ততঃ বছরের একটি দিনও স্মরণ না করিলে আমাদের বোধহয় একটু অকৃতজ্ঞতাই হয়।

উৎসব

দৈনন্দিন গুরু স্মরণে বা পূজায় দেখা যায় সাধারণতঃ আমরা নিজে একা একা অথবা পরিবারের দুই চারিজন মিলিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে পূজাদি করিয়া থাকি। উৎসবটি যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন দেখা যায় একটি স্থানে বহুজন, বহু পরিবার একত্রিত হইয়া বহুরকম আয়োজনাদির দ্বারা ঐ পূজাটি অনুষ্ঠিত করে। এই উৎসবটিতে স্থান-স্থানান্তর হইতে আগত উচ্চ-নীচ, ধনী, দরিদ্র সকলে সম্মিলিত হইয়া এক আনন্দের উৎসে প্লাবিত হয়। সমষ্টি মনের এই

প্লাবনে ব্যষ্টি মনের বল বাড়িয়া যায়। বোধহয় উৎস কথাটির সঙ্গে উৎসব কথাটির কোন যোগাযোগ আছে। যেমন কোন সভা সমিতিতে বহুজন একত্রিত হইয়া পরস্পর মত-বিনিময় করেন এবং সম্মিলিত ভাবে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে যে তফাৎ ঐ সময় তাহা ধরা পড়ে। এই কারণেও উৎসবটিতে বহুমুখী আলোচনা ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিয়া জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তীর্ণ করা সম্ভব হয়। শেষে একটা কথা বলি, এই গুরু; এই পূর্ণিমা, এই উৎসব- সবটিরই প্রয়োজন আছে; পালনও আমরা করিব, কিন্তু উৎসবের পরের দিনই যদি সব ভুলিয়া যাই তাহা হইলে উৎসবের ফলটি আমাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। গৃহের বাসন পত্রাদিকে প্রতিদিন মাজিয়া না রাখিলে, শরীরকে প্রতিদিন পরিষ্কার না করিলে যেমন মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ এই গুরুপূজার স্মৃতিকে জাগরুক রাখিয়া নিজ নিজ সাধ্যমত শ্রীগুরু উপদিষ্ট প্রণালী মত শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা- ধৈর্য্য ও অনলসভাবে একটু একটু আচরণ করিয়া গেলে আমাদের জীবনে ঐ জিনিষ সফল হইবে। ভুলিয়া গেলে বা ছাড়িয়া দিলে দেরী হইয়া যাইবে। সময় নষ্ট হইবে। মনে রাখা দরকার উৎসবটি একদিন এবং বহুজনের সমষ্টিগত। আর গুরুপদিষ্ট আচরণ কিন্তু নিজ

নিজ ব্যক্তিগত। কাজেই নিজ নিজ কর্ম নিজেকে ফল দিবে।

গুরুস্তুতির ব্যাখ্যা

ভব সাগর তারণ কারণ হে
রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ১

ভব–মানে পৃথিবী, সংসার। সাগর মানে জলাশয়। সাগরে যেমন ঢেউ ইত্যাদি থাকে; সাঁতরাইয়া সাগরের পরপারে যাওয়া যেমন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, তদ্রূপ সংসারটাও যেন একটা সাগর। এখানকার ঢেউ যেন নানাবিধ দুঃখ, কষ্ট, নানা ঝামেলা। এই দুঃখ, কষ্ট, ঝামেলা অতিক্রম করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সমুদ্র পার হইতে যেমন যানের প্রয়োজন হয় এইরকম এই দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করিতে গেলেও একজনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই সাহায্য করিয়া থাকেন গুরু। ভব সাগর তারণের কারণ গুরু। রবিনন্দন মানে যম। যমের হাতে আমাদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন খণ্ডন করেন গুরু। কিঙ্কর মানে দাস। শরণাগত মানে আশ্রিত। সংসার তাপে ক্লিষ্ট ও ভীত

হইয়া গুরুর আশ্রয় নিয়াছেন শিষ্য। প্রার্থনা করিতেছেন, হে গুরু এই দীনজনে দয়া কর। গু-অর্থে অন্ধকার; রু-অর্থে দূর করা। শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার যিনি দূর করিয়া, শিষ্যের আত্মজ্ঞান জাগাইয়া দেন তিনিই গুরু। আত্মজ্ঞান লাভে সর্বদুঃখের হানি হয়। এখানে দীন জনের অর্থ শুধু দরিদ্র নহে। দীন মানে নম্র, বিনয়ী, এক কথায় নিরহঙ্কারী, নম্র, বিনয়ী এবং নিরহঙ্কারীকেই গুরু দয়া করিয়া থাকেন।

হৃদি কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥২

হৃদি-অর্থে হৃদয়; কন্দর মানে গুহা; হৃদয় রূপ গুহাতে সাধারণতঃ অন্ধকার থাকে; তামস অর্থাৎ তম গুণ অন্ধকারস্বরূপ; হৃদয়স্থিত আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে। এই অন্ধকার রূপ তামস অর্থাৎ তম গুণ দূর করেন গুরু। ভাস্কর মানে সূর্য। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করেন গুরুকৃপারূপ সূর্য অর্থাৎ জ্ঞান ঐ অন্ধকার দূর করেন।

পরব্রহ্মই গুরু। সেই গুরুরূপী ব্রহ্ম জগতের স্থিতিকারী রূপে বিষ্ণু, সৃষ্টিকারী রূপে প্রজাপতি (ব্রহ্মা), লয়কারী

রূপে মহাদেব (মহেশ্বর)পরাৎপর–পর মানে শ্রেষ্ঠ। (পর মানে শত্রুও হয়। এখানে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম); পর হইতেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদ ভনে–অর্থাৎ গুরুই পরমব্রহ্ম একথা বেদ ঘোষণা করে। ভনে অর্থাৎ ঘোষণা বা প্রকাশ করে।

মন-বারণ-শাসন অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ-তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৩

মন মানে চিন্তা স্রোত (waves of thought), সংকল্প-বিকল্প বা জল্পনা-কল্পনার ধারা। এই মনই মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ। "মনএব কারণং মনুষ্যানাং সুখদুঃখয়োঃ।" এই মনকে অতিক্রম করিতে পারিলে অর্থাৎ চিন্তা স্রোত হইতে নিজেকে পৃথক করিতে পারিলে দুঃখের আঘাত লাগে না।এই মন অত্যন্ত দুর্দমনীয়। মত্ত হস্তীর ন্যায় বলবান। মত্ত হস্তীকে মাহুত যেমন অঙ্কুশ (একটি হাতিয়ার) দ্বারা হাতীর মাথায় আঘাত করিয়া হাতীকে বশে আনে তদ্রূপ গুরুশক্তির দ্বারা আমাদের মনও বশীভূত হয়।

নরত্রাণ অর্থাৎ মানুষকে ত্রাণ করিবার জন্য অব্যক্ত ব্রহ্ম মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া ব্যক্ত রূপে মানুষের কাছে

চক্ষুগোচর হন।

এই গুরুর গুণগানে দেবগণও রত থাকেন, দেবগণও গুরুর গুণগান করেন।

কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে,
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৪

আমাদের মেরুদণ্ডের একেবারে নিম্নাংশে ত্রিকোণাকৃতি একটি বস্তু থাকে। সেইখানে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় একটি শক্তি থাকেন। এখানেই ইড়া, পীঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী আছে। ইহাকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে। এই শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিতা অবস্থায় থাকেন। এই নিদ্রিতা অবস্থা হইতে গুরুশক্তি তাহাকে জাগ্রত করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে ষড়চক্রের মধ্য দিয়া উর্দ্ধদিকে পরিচালিত করেন। ইহাতে ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। ভঞ্জক মানে যিনি ভঙ্গ করেন। ঘুমকে যিনি ভাঙ্গান। আমাদের হৃদয়ে সাধারণতঃ তিনটি গ্রন্থি থাকে (ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি)। গ্রন্থি মানে বাধা অর্থাৎ প্রতিবন্ধক। রশির গাঁট না খুলিলে রশি যেমন ঠিক হয় না এইরকম। হৃদয়গ্রন্থি বিদারণ মানে খোলা বা ভেদ করা। এই হৃদয় গ্রন্থি খোলা

বা ভেদ করার কাজ করেন গুরু।

আমাদের মন রাত্রদিন চব্বিশ ঘন্টাই চঞ্চল থাকে, ইহা প্রত্যহই আমরা দেখিতে পাই। ভাল বা মন্দ একের পর এক চিন্তা আমাদের মনে উঠিতেছে ও পড়িতেছে; এই চিন্তার কোন বিরাম দেখা যায় না। ঘুমন্ত অবস্থায়ও এই মন দোকানে যাইয়া চা খায়, ফুটবল খেলে; ঘুমেও মনের চিন্তার বিরাম নাই। গুরুকৃপায় এই মনের চঞ্চলতা শান্ত হয়।

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে,
সুখশান্তি বরাভয় দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৫

আমাদের দেহের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য–এই ছয় রিপু রহিয়াছে। রিপু অর্থে শত্রু বুঝায়। এই রিপুগণ আমাদের মনকে অশান্ত ও চঞ্চল করিয়া রাখে। গুরু কৃপায় এই রিপুগণ শোধিত অর্থাৎ পবিত্র হয়। ইহাতে আমাদের মঙ্গল অর্থাৎ কল্যাণ বা শান্তি লাভ হয়।

সুখ শান্তি–সুখ দুই রকমের। পার্থিব নানাবিধ বস্তু আমাদের মনের অনুকূল মত পাইলে আমরা একটা সুখ

পাই। এই সুখটা স্থায়ী হয় না। আর একটি সুখ পাই আত্মা হইতে। ইহা শাশ্বত, চিরস্থায়ী সুখ। শান্তি–মনের সর্বপ্রকার চঞ্চলতা ও উত্তেজনা দূর হইলে মনের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার নাম শান্তি। এই সুখ ও শান্তি এবং বর ও অভয় গুরু দিয়া থাকেন।

আমাদের জীবনে তিনটি তাপ আসে। শরীরে রোগাদির জ্বালা। মনের বিরুদ্ধাচরণ পাইলে একটা জ্বালা। এই দুইটি অধ্যাত্ম তাপ। প্রাণি হইতে দুঃখ; একজন আর একজনকে মারে, সাপে দংশন করে, বাঘে খায়। ইহা প্রাণিজাত দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ (তাপ)। ভূত মানে প্রাণি। আর একটি দুঃখ আসে প্রকৃতি হইতে। ভূমিকম্প, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি। ইহা আধিদৈবিক দুঃখ বা তাপ। গুরুর দেওয়া নামে (উপযুক্ত আচরণে) এই ত্রিতাপ জ্বালা দূর হয়।

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৬

অভিমান মানে–আঘাত লাগা। আমার মান অর্থাৎ আমার অহংকারে আঘাত লাগিলে যে অবস্থা সে অবস্থার

নাম অভিমান। অভিমান অহংকারের চেয়েও শক্তিশালী। অহংকার অনেক সময় আঘাতে দূর হয়। কিন্তু লুক্কায়িত অহংকার (অভিমান) সহজে দূর হইতে চায় না। গর্তের ভিতরে লুক্কায়িত সাপকে যেমন সহজে মারা যায় না তদ্রূপ। এই অভিমান দূর না হইলে গুরুতে শরণাগত হওয়া সম্ভব নয়। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রবল বাধা। তাই শ্রীগুরু এই অভিমানের প্রভাব (অর্থাৎ শক্তিকে) দূর করেন। বিমর্দ্দন মানে মুছে ফেলা। যিনি মুছে ফেলেন তিনি বিমর্দ্দক।

গতিহীন জনকে তিনি রক্ষা করেন। গতি মানে–প্রবাহ,চঞ্চলতা, বিক্ষেপ ইত্যাদি। গতির আর এক অর্থ উপায়। যেমন আমরা বলি আমার কোন গতি (উপায়) নাই। যাহার কোন উপায় না থাকে; যিনি নিজেকে যথার্থই দুর্বল বা নম্র বলিয়া বোধ করেন শ্রীগুরু তাহাকেই রক্ষা করেন। আরেক অর্থে গতি মানে চঞ্চলতা। অর্থাৎ মন যখন গতিহীন অর্থাৎ স্থির হয় সেই একচিত্ত (এক মন) শিষ্যকেই গুরু রক্ষা করেন। যেমন দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন কৃষ্ণ। একটি যাঁতায় দুই পাথরের মধ্যে একটি খিল থাকে। খিলের কাছে যে গমটি থাকে তাহা পিষে না। সেখানে গতি নাই। অন্য গমগুলি পিষিয়া যায়, সেখানে গতি আছে। অর্থাৎ গুরুতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিলে তিনি রক্ষা করেন।

শিষ্যের চিত্ত নানাবিধ কারণে শঙ্কিত অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে সন্দেহাকুল আর ভক্তি ধনেও বঞ্চিত থাকে। তাই গুরুর দয়া শিষ্য প্রার্থনা করেন।

তব নাম সদা শুভ সাধক হে,
পতিতাধম মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৭

গুরুর নাম সর্বদাই শুভ অর্থাৎ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। পতিত মানে যাহার পতন হইয়াছে। অর্থাৎ অপবিত্র হইয়াছে। সেই অপবিত্র শিষ্যকে যিনি পাবন করেন অর্থাৎ পবিত্র করেন। পাবক মানে পবিত্রকারী।

আমাদের শুদ্ধ মনেই অর্থাৎ পবিত্র মনেই তোমার অর্থাৎ গুরুর মহিমা গোচরীভূত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষিভূত হয়। মলিন মনে গুরুর মহিমা প্রত্যক্ষ হয় না।

জয়-সদ্‌গুরু-ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৮

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্ ।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥

একং নিত্যং বিমলং অচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্ ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং ত্বং নমামি ॥"

—ইহা সদ্‌গুরুর লক্ষণ । এই সদ্‌গুরু ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন বলিয়া প্রাপক । ভবরোগ বিনাশক—অর্থে ত্রিতাপ জ্বালা যিনি দূর করেন ।

গুরুর চরণে যদি আমরা সবসময় মনকে রাখি এবং গুরুকে কেবল একটি মানুষমাত্র মনে করি তাহা হইলে ঐ দেহেতেই সব সময় মন রাখিলে সংসারে হাট বাজার, চাকুরী, গৃহকর্মাদি কিছুই করা সম্ভব হইবে না । ইহাতে উল্টো ফল হইবে । তাই জানিতে হইবে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, সর্বপ্রাণী-সর্বভূতে, নিয়ন্তা রূপে গুরু রহিয়াছেন । গাছে জল দিই, সেখানেও গুরু; যাহার সঙ্গে কথা বলি, সেখানেও গুরু; যাহাকে খাওয়াই সেখানেও গুরু । "যত্র যত্র দৃষ্টি পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে ।" যেখানেই চোখ পড়ে সেখানেই কৃষ্ণ । কৃষ্ণই গুরু । তাহা হইলে—জগতের সর্বত্রই শ্রীগুরু ভগবান রহিয়াছেন বলিয়া মন গুরু ছাড়া অন্য কোথায় থাকিবে? শিষ্য প্রার্থনা করিতেছেন, আমার মন যেখানেই যায় সেখানেই যেন আমি তোমাকে দেখি । তাই ঐ প্রার্থনা—"মন যেন রহে তব শ্রীচরণে" ।